নাটক

শ্রাবণগাথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নটরাজ। মহারাজ, আদেশ করেন যদি, বর্ষার অভ্যর্থনা দিয়ে আজ উৎসবের ভুমিকা করা যাক।

রাজা। ভূমিকার কী প্রয়োজন।

নটরাজ। ধুয়োর যে প্রয়োজন গানে। ঐ ধুয়োটাই অঙ্কুরের মতো ছোটো হয়ে দেখা দেয়, তার পরে শাখায় পল্লবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজা। আচ্ছা, তা হলে বিলম্বে কাজ নেই।

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হয়ষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ;
নিখিল চিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।
আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা

ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা,
        মেঘমল্লার রাগিণী ;
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
        অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
        স্মিতবিকশিত বয়নে,
        কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
        গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে গন্ধমদির বাতাসে
        শতেক যুগের গীতিকা,
শত-শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।।

নটরাজ। ওগো কমলিকা, এখন তবে শুরু করো তোমাদের পালা।

রাজা। কী দিয়ে শুরু করবে।

নটরাজ। বনভূমির আত্মনিবেদন দিয়ে।

রাজা। কার কাছে আত্মনিবেদন।

নটরাজ। আকাশপথে যিনি এসেছেন অতিথি-- আবির্ভাব যাঁর অরণ্যের রাসমঞ্চে, পূর্বদিগন্তে উড়েছে যাঁর কেশকলাপ।

সভাকবি। ওহে নটরাজ, আমরা আধুনিক কালের কবি-- ফুলকাটা বুলি দিয়ে আমরা কথা কই নে-- তুমি যেটা অত করে ঘুরিয়ে বললে, আমরা সেটাকে সাদা ভাষায় বলে থাকি বাদলা।

নটরাজ। বাদলা নামে রাজপথের ধুলোয়, সেটাকে দেয় কাদা ক'রে। বাদলা নামে রাজপ্রহরীদের পাগড়ির 'পরে, তার পাকে পাকে জমিয়ে তোলে কফের প্রকোপ। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি নামেন ধরণীর প্রাণমন্দিরে, বিরহীর মর্মবেদনায়।

রাজা। তোমাদের দেশের লোক কথা জমাতে পারে বটে।

সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন্ দুঃখে। এইবার শুরু করো।

বাকি আমি রাখব না কিছুই।

তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।

ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়

গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,

উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই।

পুরব-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,

আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।

আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান,

সব তোমারেই করেছি দান,

দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছুঁই।।

রাজা। দেখলুম, শুনলুম, লাগল ভালো, কিন্তু বুঝে পড়ে নিতে গেলে পুঁথির দরকার। আছে পুঁথি ?
নটরাজ। এই নাও, মহারাজ।

রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা নাকি।

নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে

রাজা। কিন্তু, রচনা যার সে গেল কোথায়।

নটরাজ। সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। পালাবার তাৎপর্য কী।

নটরাজ। পাছে এখানকার বুদ্ধিমানরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরো দুঃখের বিষয়-যদি কিছু না বলে হাঁ করে থাকেন।

সভাকবি। এ তো বড়ো কৌতুক। পাঁজিতে লিখছে পূর্ণিমা, এ দিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলোটা ঝাপসা।

নটরাজ। বিশল্যকরণীটারই দরকার, গন্ধমোদনটা বাদ দিলেও চলে। না'ই রইলেন কবি, গানগুলো রইল।

সভাকবি। একটা ভাবনার বিষয় রয়ে গেল। গানে স্বয়ং কবিই সুর বসিয়েছেন নাকি।

নটরাজ। তা নয় তো কী। ফুলে যিনি দিয়েছেন রঙ তিনিই লাগিয়েছেন গন্ধ।

সভাকবি। সর্বনাশ ! নিজের অধিকারে পেয়ে এবার দেবেন রাগিণীর মাথা হেঁট ক'রে। বাণীকে উপরে চড়িয়ে দিয়ে বীণার ঘটাবেন অপমান।

নটরাজ। অপমান ঘটানো একে বলে না, এ পরিণয় ঘটানো। রাগিণী যতদিন অনূঢ়া ততদিন তিনি স্বতন্ত্র। কাব্যের সঙ্গে বিবাহ হলেই তিনি কবিত্বের ছায়েবানুগতা। সপ্তপদীগমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব স্ত্রৈণের লক্ষণ। সেটা তোমাদের গৌড়ীয় পারিবারিক রীতি হতে পারে, কিন্তু রসরাজ্যের রীতি নয়।

রাজা। ওহে কবি, কথাটা বোধ হচ্ছে যেন তোমাকেই লক্ষ্য করে ! ঘরের খবর জানলে কী করে।

সভাকবি। জনশ্রুতির 'পরে ভার, বানানো কথায় লোকরঞ্জন করা।

রাজা। জনশ্রুতিকে তা হলে কবি আখ্যা দিলে হয়। অলমতিবিস্তরেণ। যথারীতি কাজ আরম্ভ করো।

সভাকবি। আমরা সহ্য করব ওঁদের স্বরবর্ষণ, মহাবীর ভীষ্মের মতো।

নটরাজ। ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে, প্রণতি। রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জলদগ্নি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে শ্যামল জটাভার-প্রসন্ন তাঁর মুখ। প্রথমে সেই বন্ধুদর্শনের আনন্দকে আজ মুখরিত করো।

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।
অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে
তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে।
ভরুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলনস্বপন মধুর বেদনা-ভরা।
পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক আড়াল,
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝুলুক পরম দর্শনে।

নমো নমো নম করুণাঘন নম হে।
নয়নসিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পুর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধনসার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।
নম হে নম হে।।

সভাকবি। নটরাজ, মহারাণী-মাতার কল্যাণে সেদিন রাজবাড়ি থেকে কিছু ভোজ্যপানীয় সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিলেম গৃহিণীর ভাণ্ডার-অভিমুখে। মধ্যপথে বাহনটা পড়ল উঁচট খেয়ে, ছড়িয়ে পড়ল মোদক মিষ্টান্ন পথের পাঁকে, গড়িয়ে পড়ল পায়সান্ন ভাঙা হাঁড়ি থেকে নালার মধ্যে। তখন মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে-নৈবেদ্যটা শ্রাবণ স্বয়ং নিয়ে গেলেন ভাসিয়ে। তোমাদের এই প্রণামটাও দেখি সেইরকম। খুবই ছড়িয়েছে বটে, কিন্তু পৌছল কোথায় ভেবে পাচ্ছি নে।

নটরাজ। কবিবর, আমাদের প্রণামের রস তোমার হাঁড়িভাঙ্গা পায়েসের রস নয়-- ওকে নষ্ট করতে পারবে না কোনো পাঁকের অপদেবতা ; সুরের পাত্রে রইল ও চিরকালের মতো, চিরকালের শ্যামল বঁধুর ভোগে বর্ষে বর্ষে ওর অক্ষয় উৎসর্গ।

রাজা। কিছু মনে কোরো না নটরাজ, আমাদের সভাকবি দুঃসহ আধুনিক। হাঁড়িভাঙা পায়েসের রস পাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঞ্চশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না সেই রসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভাণ্ডারের । তোমার কাজ অসংকোচে করে যাও, এখানে অন্য শ্রোতাও আছে।

নটরাজ। বনমালিনী, এবার তবে বর্ষাধারাস্নানের আমন্ত্রণ ঘোষণা করে দাও নূপুরের ঝংকারে, নৃত্যের হিল্লোলে। চেয়ে দেখো, শ্রাবণঘনশ্যামলার সিক্ত বেণীবন্ধন দিগন্তে স্খলিত, তার ছায়াবসনাঞ্চল প্রসারিত ঐ তমালতালীবনশ্রেণীর শিখরে শিখরে।

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ-
কাজল নয়নে, যূথীমালা গলে,
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি খনে খনে হাসিখানি সখী,

অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক বাণী আনি বনমর্মরে-
ঘন বরিষনে জলকলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।।

রাজা। উত্তম। কিন্তু চাঞ্চল্য যেন কিছু বেশি, বর্ষাঋতু তো বসন্ত নয়।

নটরাজ। তা হলে ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে পুলক জেগেছে, সে পুলক গভীর, সে প্রশান্ত।

সভাকবি। ঐ তো মুশকিল। ভিতরের দিকে ? ও দিকটাতে বাঁধা রাস্তা নেই তো।

নটরাজ। পথ পাওয়া যাবে সুরের স্রোতে। অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস উঠেছে সেখানে-কার বিরহ জানা নেই। ওগো গীতরসিকা, বিশ্ববেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিনীর মিল করো।

ঝর ঝর ঝর ভাদর-বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিনী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি।।

রাজা। কী বল হে, কী মনে হচ্ছে তোমার।

সভাকবি। সত্য কথা বলি, মহারাজ। অনেক কবিত্ব করেছি , অমরুশতক পেরিয়ে শান্তিশতকে পৌঁছবার বয়স হয়ে এল-কিন্তু এই যে এঁরা অশরীরী বিরহের কথা বলেন যা নিরবলম্ব, এটা কেমন যেন প্রেতলোকের ব্যাপার বলে মনে হয়।

রাজা। শুনলে তো, নটরাজ! একটু মিলনের আভাস লাগাও, অন্তত দুর থেকে আশা পাওয়া যায় এমন আয়োজন করতে দোষ কী।

সভাকবি । ঠিক বলেছেন, মহারাজ । পাত পেড়ে বসলে ওঁদের মতে যদি কবিত্ববিরুদ্ধ হয়, অন্তত রান্নাঘর থেকে গন্ধটা বাতাসে মেলে দিতে দোষ কী।

নটরাজ। বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা। পেটভরা মিলনে সুর চাপা পড়ে, একটু ক্ষুধা বাকি রাখা চাই, কবিরাজরা এমন কথা বলে থাকেন। আচ্ছা, তবে মিলনতরীর সারিগান বিরহবন্যার ও পার থেকে আসুক সজল হাওয়ায়।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামলে মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কুল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্রে।।

রাজা। এ গানটাতে একটু উৎসাহ আছে। দেখছি, তোমার মৃদঙ্গওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়ে উঠেছে-ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। এবার তা হলে একটা অশ্রুত গীতচ্ছন্দের মূর্তি দেখা যাক।

সভাকবি। শুনলেন ভাষাটা ! অশ্রুত গীত। নিরন্ন ভোজের আয়োজন !

রাজা। দোষ দিয়ো না, যাদের যেমন রীতি। তোমাদের নিমন্ত্রণে আমিষের প্রাচুর্য ।

সভাকবি। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, আমরা আধুনিক, আমিষলোলুপ।

নটরাজ। শ্যামলিয়া, দেহভঙ্গির নিঃশব্দ গানের জন্য অপেক্ষা করছি।

নাচ

রাজা। অতি উত্তম। শূন্যকে পূর্ণ করেছ তুমি। এই নাও পুরস্কার। নটরাজ, তোমাদের পালাগানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, এতে বিরহের অংশটাই যেন বেশি। তাতে ওজন ঠিক থাকে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ এক দিকে, একটিমাত্র ফুল এক দিকে-তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার এক দিকে, একটি তারা একদিকে-তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক-না অকূল, তারই মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পদ্মই যথেষ্ট।

সভাকবি। এঁদের দেশের লোক বাচালের সেরা, কথায় পেরে উঠবেন না। আমি বলি সন্ধি করা যাক- ক্ষণকালের জন্য মিলনও ক্ষান্ত দিক, বিরহও চুপ মেরে থাক্। শ্রাবণ তো মেয়ে নয় মহারাজ, সে পুরুষ, ওঁর গানে সেই পুরুষের মূর্তি দেখিয়ে দিন্-না।

নটরাজ। ভালো বলেছ, কবি। তবে এসো উগ্রসেন, উন্মত্তকে বাঁধো কঠিন ছন্দে, বজ্রকে মঞ্জীর ক'রে নাচুক ভৈরবের অনুচর।

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত।
হল রোমাঞ্চিত বনবনান্তর,
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘনবর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত
ঝিল্লিঝংকৃত।।

রাজা। এই তো নৃত্য! কঠিনের বক্ষপ্লাবী আনন্দের নির্ঝর। এ তো মন ভোলাবার নয়, এ মন দোলাবার।

সভাকবি। কিন্তু এই দুর্দম আবেগ বেশিক্ষণ সইবে না। ঐ দেখুন, আপনার পারিষদের দল নেপথ্যের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কড়াভোগে ওদের গলা দিয়ে নামে না, একটু মিঠুয়া চাই।

রাজা। নটরাজ, শুনলে তো। অতএব কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।

নটরাজ। প্রস্তুত আছি। তা হলে শ্রাবণপূর্ণিমার লুকোচুরি কথাটা ফাঁস করে দেওয়া যাক।

ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে।
আপনারি মনে জানি নে একেল
হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা,
তুমি আপনায় খুঁজে কি ফের
কি তুমি আপনায় হারালে।
এ কি মনে রাখা, এ কি ভুলে যাওয়া,

এ কি স্রোতে ভাসা, এ কি কূলে বাওয়া।
কভু বা নয়ানে কভু বা পরানে
কর' লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে।।

রাজা। বুঝতে পারলুম না এঁর মনোরঞ্জন হল কি না । সে অসাধ্য চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। আমার অনুরোধ এই, রসের ধারাবর্ষণ যথেষ্ট হয়েছে, এখন রসের ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দাও।

নটরাজ। মহরাজ, আপনার সঙ্গে আমারও মনের ভাব মিলছে। এবার শ্রাবণের ভেরীধ্বনি শোনা যাক। সুপ্তকে জাগিয়ে তুলুক, চেতিয়ে তুলুক অন্যমনাকে।

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে--
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা-
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যুথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে-
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে।।

রাজা। আমার সভাকবিকে বিমর্ষ করে দিয়েছ। তোমাদের এই গানে গানকে

ছাড়িয়ে গানের কবিকে দেখা যাচ্ছে বেশি, ঐখানে ইনি দেখছেন ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মনে মনে তর্ক করেছেন, কী ক'রে আধুনিক ভাষায় এর খুব একটা কর্কশ জবাব দেওয়া যায়। আমি বলি-কাজ নেই, একটা সাদা ভাবের গান সাদা সুরে ধরো, যদি সম্ভব হয় ওঁর মনটা সুস্থ হোক।

নটরাজ। মহারাজের আদেশ পালন করব। আমাদের ভাষায় যতটা সম্ভব সহজ করেই প্রকাশ করব, কিন্তু যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্রদোষঃ। সকরুণা, এই বারিপতনশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে সুরের যোগে মধুর করে তোলো।

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,

তাই ফাগুন-শেষে দিলেম বিদায়।
যখন গেলে তখন ভাসি নয়ননীরে,
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়।
বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝরো ঝরো বারিধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়।
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভ'রে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা-হারা বিজন রাতে
কেবল 'হারাই হারাই' বাজে হিয়ায়।।

সভাকবি। নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ুপ্রধান-সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কফপ্রধান ধাত বর্ষার কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তা হলে বর্ষায় বসন্তে প্রভেদটা কী।

নটরাজ। সোজা কথায় বুঝিয়ে দেব-- বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষার পাখি উড়ে চলে।

সভাকবি। তোমাদের দেশে এইটেকেই সোজা কথা বলে ! আমাদের প্রতি কিছু দয়া থাকে যদি কথাটা আরো সোজা করতে হবে।

নটরাজ। বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরুণ করে তোলে-আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণীই বল, উধাও হয়ে মুক্ত পথে চলে শূন্যে--কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে। ভাবনার এই দুই জাত আছে। মুখের তর্ক ছেড়ে সুরের ব্যাখ্যা ধরা যাক। পুরবিকা, ধরো গান।

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি ;
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ওই গাঁথি গাঁথি।
সুদূরের বাঁশির স্বরে
কে ওদেরহৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে ;
উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।

ওদের   ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে ;
অলক্ষেতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা   ছিল জানা,
সে ওদের   দিল হানা,
না জানার   পথে ওদের নাই রে মানা ;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি।।

নটরাজ।   আপনার ঐ সভাকবির মুখখানা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখুন। ওঁর গোমুখীবিনিঃসৃত বাক্যনির্ঝর এ দেশের কঠোর শিলাখণ্ডের উপর পাক খেয়ে বেড়াক। আমরা এনেছি সুরলোকের ধারা-- আলোকের সভাপ্রাঙ্গণ ধুয়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হলেই বিদায় নেব।

রাজা। আচ্ছা নটরাজ, তোমার পথের উপদ্রবকে নিরস্ত রাখব। পাল তুলে চলে যাও।

নটরাজ। মঞ্জুলা, তা হলে হাওয়াটা শোধন করে নিয়ে আর-একবার আবাহন গান ধরো।

তৃষ্ণার শান্তি,
সুন্দরকান্তি,
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।
আঁকো ধরাবক্ষে
দিক্‌বধূচক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
এলে বীর, ছন্দে-
তব কটিবন্ধে
বিদ্যুৎ-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্জন।
তব উত্তরীয়ে
ছায়া দিলে ভরিয়ে
তমালবনশিখরে নবনীল-অঞ্জন।
ঝিল্লির মন্দ্রে
মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে
এলে নবরঙ্গে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন।।

রাজা। ওহে নটরাজ, সভাকবির মুখে আর শব্দমাত্র নেই। এর চেয়ে বড়ো সাধুবাদ আর আশা কোরো না।

সভকবি। আছে মহারাজ, আছে, বলবার বিষয় আছে-হঠাৎ মুখ বন্ধ করে দেবেন না।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

সভাকবি। আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী।

রাজা। কী বলতে চাও।

সভাকবি। নৃত্যকলায় দোষ আছে, ওটাকে হেয় করেই রাখাই শ্রেয়।

রাজা। কাব্যে কোথাও কোনো দোষ সম্ভব নয় বুঝি ! কত কালিদাস এবং অকালিদাস দেখা গেল, ওঁদের শ্লোকগুলোর মধ্যে পাঁক বাঁচিয়ে চলা দায় যে।

সভাকবি। কাব্য বলুন, গীতকলা বলুন, ওরা অভিজাতশ্রেণীয়, ওদের দোষকেও শিরোধার্য করতে হয়। কিন্তু ঐ নৃত্যকলার আভিজাত্য নেই, গৌড়দেশের ব্রাহ্মণরা ওকে অনাচরণীয়া ব'লে থাকেন।

নটরাজ। কবিবর, তোমার গৌড়দেশের সূচনা হবার বহু পূর্বে যখন আদিদেবের

আহ্বানে সৃষ্টি-উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়্ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর, সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী। মানুষের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের আনন্দকে তরঙ্গিত করবার ভার নিয়েছি আমরাই ; তোমাদের মোহাচ্ছন্ন চোখে নির্মল দৃষ্টি জাগাব নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
হাসিকান্না হীরা পান্না দোলে ভালে ;
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে ;
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ-
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ ;
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে

তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।।

রাজা। এর উপরে আর কথা চলে না। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি ভালোবাসি কড়া পাকের রস। বর্ষার সবটাই তো কান্না নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জন, আছে উচ্চৈঃশ্রবার দৌড়।

নটরাজ। আছে বৈকি। এসো তবে বিদ্যুন্ময়ী, শ্রাবণ যে স্বয়ং বজ্রপাণি মহেন্দ্রের সভাসদ্, নৃত্যে সুরে তোমরা তার প্রমাণ করে দাও।

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যকুলতা।
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দুরে ;
সহসা কী হাসি হাসো, নাহি কহ কথা।
আঁধার ঘনায় শূন্যে ; নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশ প্রাণে আকাশে ললাট হানে ;
দিকে দিকে কেঁদে ফিরে কী দুঃসহ ব্যাথা।।

নটরাজ। ওহে ওস্তাদ, তোমার গানের পিছনে পিছনে ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল। গরজত বরখত চমকত বিজুরী। দুই পক্ষের পাল্লা চলুক। সুরে তালে কথায়, আর মেঘে বিদ্যুৎ ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগণ-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক-হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে ;
কিসের বাধা ; ঘরের কোণে শাসনসীমালঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন ;
শেষ ক'রে দিস আপ্‌নারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।।

সভাকবি। ঐ রে ! ঘুরে ফিরে আবার এসে পড়ল-- সেই অজানা, সেই নিরুদ্দেশের পিছনে-ছোটা পাগলামি।

নটরাজ। উজ্জয়িনীর সভাকবিরও ছিল ঐ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা ; তিনি বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ-- এখানকার সভাকবি কি তার প্রতিবাদ করবেন।

সভাকবি। এত বড়ো সাহস নেই আমার। কালিদাসকে নমস্কার ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মেঘ-দেখা হাহুতাশটাকে মনে আনতে।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে থাক্, কিছুক্ষণ হাহুতাশ, এখন অন্য কথা পাড়া যাক। মহারাজ, সব চেয়ে যারা ছোটো, উৎসবে সব চেয়ে সত্য তাদেরই বাণী। বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন-- যে কচি পাতাগুলি বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের জন্যে স্থান রাখেন অল্পই।

রাজা। সত্য বলেছ, নটরাজ। ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্তারা ভাঙা গলায় হাঁকডাক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে।

নটরাজ। ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। কিশলয়িনী, এসো তুমি শ্রাবণের আসরে।

ওরা অকারণে চঞ্চল ;
ডালে ডালে দোলে বায়ু হিল্লোলে
নব পল্লবদল।
বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী
শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি,
মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোর-কোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণ-ঝরণার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল।।

রাজা। সাধু সাধু ! কিন্তু নটরাজ, এ হল ললিত চাঞ্চল্য-- এবার একটা দুর্ললিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।

নটরাজ। এমন চাঞ্চল্য আছে যাতে বাঁধন শক্ত করে, আবার এমন আছে যাতে শিকল ছেঁড়ে। সেই মুক্তির উদ্‌বেগ আছে শ্রাবণের অন্তরে। এসো তো বিজুলি, এসো বিপাশা।

হা রে, রে রে, রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে--
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধন-হারা,

বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।
হারে, রে রে, রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে-
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন- বাধার বক্ষ চেরে।।

সভাকবি। মহারাজ, আমাদের দুর্বল রুচি, ক্ষীণ আমাদের পরিপাকশক্তি। আমাদের প্রতি দয়ামায়া রাখবেন। জানেন তো, ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ। রুদ্ররস রাজন্যদেরই মানায়।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে শোনো। কিন্তু বলে রাখছি, রস জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনি রিনি।
দুরু দুরু করে হিয়া,
মেঘ উঠে গরজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি।
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা,
গগনে নাহি শশী তারা।
বিজুলির চমকনে
মিলে আলো খনে খনে,
খনে খনে পথ ভোলে উদাসিনী।।

নটরাজ। অরণ্য আজ গীতহীন, বর্ষাধারায় নেচে চলেছে জলস্রোত বনের প্রঙ্গণে--যমুনা, তোমরা তারই প্রচ্ছন্ন সুরের নৃত্য দেখিয়ে দাও মহারাজকে।

নাচ

রাজা। তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পৌঁছল-- এইবার গভীরে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্তব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সম্মিলন।

নটরাজ। আমারও মন তাই বলছে।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।

সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,   সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে,
সপ্তসিন্ধু দিক-দিগন্ত জাগাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে   সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।।

নটরাজ। মহারাজ, রাত্রি অবসানপ্রায়। গানে আপনার অভিনিবেশ কি ক্লান্ত হয়ে এল।

রাজা। কী বলো, নটরাজ! মন অভিষিক্ত হতে সময় লাগে। অন্তরে এখন রস প্রবেশ করেছে। আমার সভাকবির বিরস মুখ দেখে আমার মনের ভাব অনুমান কোরো না। প্রহর গণনা ক'রে আনন্দের সীমানির্ণয়! এ কেমন কথা।!

সভাকবি। মহারাজ, দেশকালপাত্রের মধ্যে দেশও অসীম, কালও অসীম, কিন্তু আপনার পাত্রদের ধৈর্যের সীমা আছে। তোরণদ্বার থেকে চতুর্থ প্রহরের ঘন্টা বাজল, এখন সভাভঙ্গ করলে সেটা নিন্দনীয় হবে না।

রাজা কিন্তু তৎপূর্বে উষাসমাগমের একটা অভিনন্দন-গান হোক। নইলে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ হবে। যে-অন্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশ্বাস না রেখেই যায় সে তো প্রলয়সন্ধ্যা।

নটরাজ। এ কথা সত্য। তবে এসো অরুণিকা, জাগাও প্রভাতের আগমনী। বিশ্ববেদীতে শ্রাবণের রসদানযজ্ঞ সমাধা হল। শ্রাবণ তার কমণ্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে-
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়-
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।

মালতীর বনে বনে
ওই শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়-
আয় আয় আয়।।

নটরাজ। মহারাজ, শরৎ দ্বারের কাছে এসে পৌঁচেছে, এইবার বিদায়গান। রসলোক থেকে আপনার সভাকবি মুক্তি পেলেন বস্তুলোকে।

সভাকবি। অর্থাৎ, অপদার্থ থেকে পদার্থে।

বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।
ছাড়ল খেয়া ও পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর।
কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধূলি ,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর।।